৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০২

টপিক:

জনসংখ্যাতত্ত্ব: বাংলাদেশের আদমশুমারি, জনসংখ্যার বৈচিত্র্য, উপজাতিদের অবস্থান এবং সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি: প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত (১৯৪৭-পূর্ব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা), সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

*স.

* ১২০৪ = নদীয়া

১২০৬ = মুসলিম

১২১২ : গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী

১২৭২ : বাঙলী — তোঘ্রল

১২৮২ = আয়বেক আক্রমণ

১২২২ = [illegible]

* ১২৫৫ = [illegible]

* ১২৮০

১২৮৬ :

১২৮৭ : [illegible]

১৩৩৮ : বাঙলী ফখরুদ্দিন

= সোনারগাঁও

: স্বাধীন [illegible]

~~প্রায় ১৩৫২~~

জনসংখ্যা তত্ত্ব (Demography)

❖ জনসংখ্যা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

➲ জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক **রবার্ট ম্যালথাস**।

➲ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব মতে, জনসংখ্যা **বাড়ে জ্যামিতিক হারে**প্ম যেমন- ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি। আর, খাদ্য উৎপাদন **বাড়ে গাণিতিক হারে**প্মযেমন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি।

জনতত্ত্ব (Demography)

❖ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (জনমিতিক লভ্যাংশ)

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশ এক বিরল সম্ভাবনাময় সময় পার করছে। এ এক অপার সম্ভাবনা যা কোনো জাতির জীবনে একবার কিংবা কয়েকশত বছরে একবার আসে। আজকের চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া- এসব দেশ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া সেই স্বর্ণালি ক্ষণটি প্রায় ২০৩৮ সাল পর্যন্ত থাকবে। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যে স্বপ্ন তা অনেকটাই নির্ভর করছে এই সময়টিকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়নের ওপর। এই সম্ভাবনার নাম ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ বা জনসংখ্যার বোনাসকাল।

একটি দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ যদি কর্মক্ষমহীন জনসংখ্যার তুলনায় বেশি হয় তাহলে এই অবস্থাটাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ বলে। একটি দেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫-৬৪ বছর বয়সী মানুষের হার ৫০% এর বেশি হলে সেই দেশকে জনসংখ্যার বোনাসকাল বলে। বাংলাদেশ ২০১২ সালে এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ২০০৭ সালে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬১ শতাংশের বয়স এই সীমার মধ্যে ছিল যা বর্তমানে প্রায় ৬৮ শতাংশ। কর্মক্ষম মানুষের এই আধিক্য ২০৩৮ সাল পর্যন্ত বজায় থেকে এর পর কমতে থাকবে। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সকে কর্মক্ষম বয়স হিসেবে ধরা হয়। এই শ্রমশক্তির উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী?

২০০৭ : ২০৩১

২০১২ - ২০৪৬

২০৪১ : মোট জনসংখ্যা

২৪ :

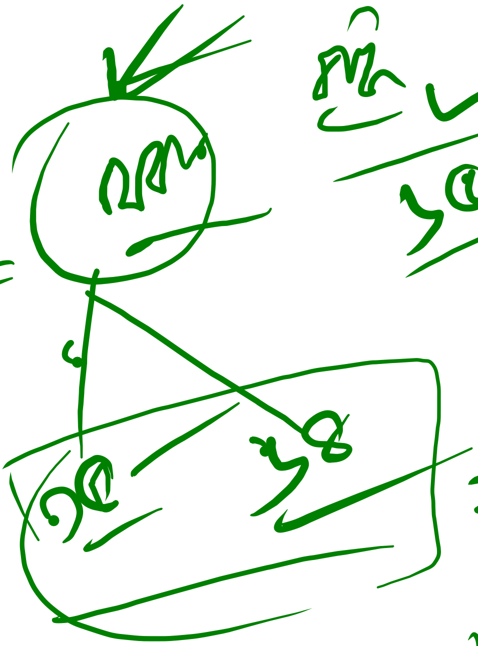

মূল

১৫

= ৫০%

একদা : চীন
জাপান
দক্ষিণ কোরিয়া
মালয়েশিয়া

২০০৭ - ২০০৫ মিলি

২০২২ - ৪২ - মিলি

= ৬০ কোটি (মানুষ)

জনতত্ত্ব (Demography)

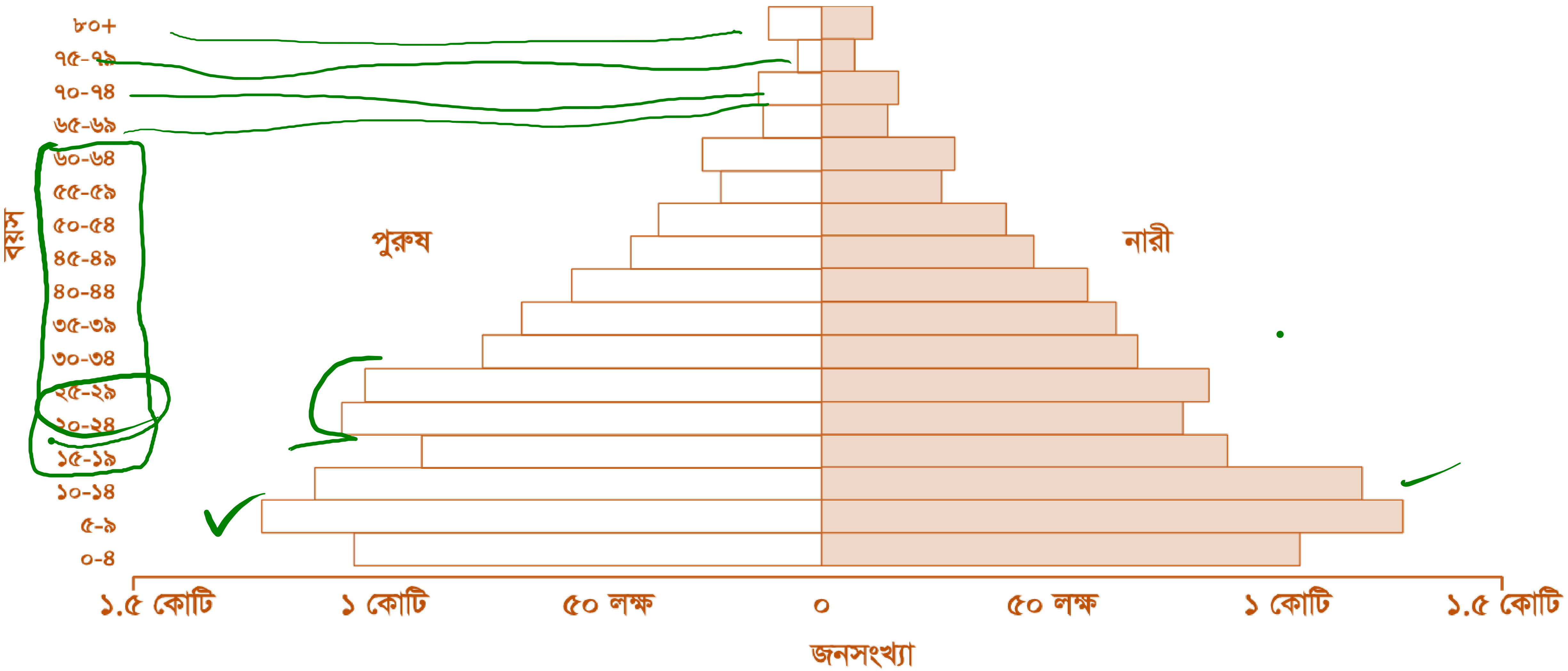

বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

জনশুমারি

জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাপ

জনসংখ্যার ঘনত্বের সূত্র, $DP = \frac{TP}{TA}$

এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population); TP = মোট জনসংখ্যা (Total Population); TA = মোট আয়তন (Total Area)

সুতরাং জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে মোট জনসংখ্যার সাথে মোট আয়তনের অনুপাতকে বোঝায়। কোনো দেশের ঘনত্ব দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জমির উর্বরতা, শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ও পরিবহণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিমাপ: ৬ষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা হলো ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন এবং আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এ তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে -

$DP \ \frac{১৬,৫১,৫৮,৬১৬}{১,৪৭,৫৭০} =$ **১১১৯** জন। অর্থাৎ, প্রতি বর্গকিলোমিটারে **১১১৯** জন লোক বাস করে।

জনশুমারি

জন্মহার

$$\frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মগ্রহণকারী জীবিত শিশুর মোট সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

মৃত্যুহার

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্য সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুরহার}}{১০০০} \times ১০০$$

জনশুমারি

বাংলাদেশে জনশুমারির ঐতিহাসিক পরিক্রমা

সাল	জনসংখ্যার পরিমান (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	৭.১৪৮	২.৪৮
১৯৮১	৮.৭১২	২.৮৪
১৯৯১	১০.৬৩	২.০১
২০০১	১২.৪৩	১.৫৮
২০১১	১৪.৪০	১.৪৬
২০২২	১৬.৫২	১.২২

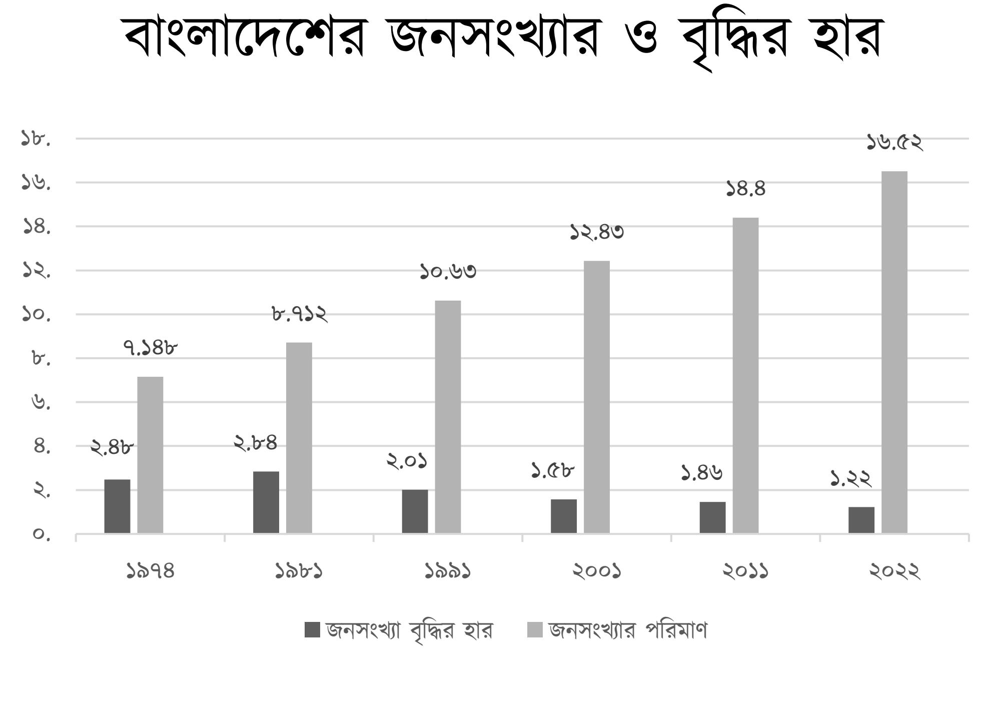

[তথ্যসূত্র : বিগত আদমশুমারি এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২]

জন্ম - দিনাজ

কুমুমারী? মানাচ ভোলামাম বং.

১৪ বছ.

১৯৭৪.

৬টি:

১৯৮২.

১৯৯১.

২০০১.

২০১১.

2022

১৫ কোটি: - 2022 - বিজ্ঞান

৫ম শুমারি

জনসংখ্যা — ১৬ কোটি ৯৮ লাখ প্রায়

পুরুষ : নারী — ৯৮ : ১০০

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — ১.২২%

ঘনত্ব → ১১১৯

→ ৩%

প্রবৃদ্ধি (রেমিট্যান্স)

= ৫০%

মুসলিম = ৯১.০৪%

হিন্দু = ৭.৯৫%

সাক্ষরতা — ৭৪.৬৬%

L2

ER

৬.৯৪%

✓ ৭.২৫%

প্রবৃদ্ধি

৬.৫%

৭.২৫%

.৯৯

জনশুমারি

জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন' স্লোগানকে উপজীব্য করে দেশে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জুন রাত থেকে ২১ জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া জনশুমারিটি দেশের প্রথম ডিজিটাল শুমারি, যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি মাইলফলক। ১০ বছর অন্তর হিসাবে ২০২১ সালে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার কারণে, বিশেষ করে করোনা মহামারি ও ট্যাব কেনার জটিলতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২-এর প্রাথমিক ফলাফল ২৭ জুলাই, ২০২২ তারিখে ঘোষণা করা হয়।

এটি বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুমারি। এই জনশুমারিতে ৩৫ ধরনের তথ্য নেওয়া হয়। জনশুমারিতে SDG বাস্তবায়নের ৯টি সূচকের তথ্য রয়েছে। আগের প্রতিটি শুমারি হয়েছিল জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। এবারই প্রথম বর্ষাকালে জনশুমারি হয়। এই জনশুমারিতে প্রথমবারের মতো তৃতীয় লিঙ্গকে যুক্ত করা হয়। এই জনশুমারি আরেক দিক থেকে অনন্য আর সেটি হলো, প্রথমবারের মতো বেশ কিছু ডিজিটাল প্রযুক্তি এই শুমারিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

জনশুমারি

- **GIS:** পূর্ণরূপ Geographic Information System, এর মাধ্যমে Digital Map এ Enumeration Area প্রস্তুত ও Geocode এর সমন্বয় করা হয়। শুমারি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তসমূহ Digital Map এর সাথে সমন্বিত করে ব্যবহার করা হয়।

- **ICMS:** পূর্ণরূপ Integrated Census Management System, এটি শুমারি কাজে ব্যবহৃত একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শুমারি কার্যক্রমে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট গণনাকারী, সুপারভাইজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন মনিটরিং করা হয়।

- **CAPI:** পূর্ণরূপ Computer Assisted Personal Interviewing, এই প্রযুক্তিতে Mobile Device Management সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুমারি কাজে ব্যবহৃত ট্যাব ও সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং প্রায় ৪ লক্ষ ব্যবহারকারীর তথ্য-উপাত্ত এনক্রিপ্টেড অবস্থায় সার্ভারে প্রেরণ করা হয়। এই প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত এপ্লিকেশন ও সার্ভারসমূহ Tier-4 Data Center এ স্থাপন করা হয়।

জনশুমারি

২০২২ ও ২০১১ জনশুমারির মধ্যে কিছু সূচকে তুলনা

ক্র. নং	প্রধানসূচক	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২	আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
	জনসংখ্যা		
০১	বাংলাদেশ	১৬,৯৮,২৮,৯১১	১৪,৪০,৪৩,৬৯৭
	পুরুষ	৮,৪০,৭৭,২০৩	৭,২১,০৯,৭৯৬
	মহিলা	৮,৫৬,৫৩,১২০	৭,১৯,৩৩,৯০১
	হিজড়া	১২,৬২৯	-
০২	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার	১.২২	১.৪৬ (সমন্বয়কৃত ১.৩৭)
০৩	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১১৯	৯৭৬
০৪	লিঙ্গানুপাত (পুরুষ:নারী)	৯৮:১০০	১০০.৩:১০০

জনশুমারি

ক্র. নং	প্রধানসূচক	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২	আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
০৫	নির্ভরশীলতা অনুপাত		
	জাতীয়	৫২.৬৪	৭৩.০০
	পল্লী	৫৬.০৯	৭৭.০০
	শহর	৪৫.৬৩	৬৯.০০
০৬	সাক্ষরতা (%) (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব)		
	জাতীয় (পুরুষ ও মহিলা উভয়)	৭৪.৬৬	৫১.৭৭
	পুরুষ	৭৬.৫৬	৫৪.১১
	মহিলা	৭২.৮২	৪৯.৪৪
০৭	মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী (%) (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব)		
	জাতীয়	৫৫.৮৯	-
	পুরুষ	৬৬.৫৩	-
	মহিলা	৪৫.৫৩	-

জনশুমারি

ক্র. নং	প্রধানসূচক	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২	আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
০৮	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (%) (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব)		
	জাতীয়	৩০.৬৮	-
	পুরুষ	৩৮.০২	-
	মহিলা	২৩.৫২	-
০৯	খাবার পানির প্রধান উৎস (%)		
	ট্যাপ / পাইপ (সাপ্লাই)	১১.৭৪	১০.২৭
	টিউবওয়েল (গভীর/ অগভীর)	৮৫.৬৬	৮৩.৯২
	বোতলজাত পানি/ পানির জার	০.৫৯	-
	কূপ/কূয়া	০.৩৫	-
	পুকুর/ নদী/ খাল/ লেক	০.৮৯	-
	ঝরণা	০.১২	-
	বৃষ্টির পানি	০.৪২	-
	অন্যান্য	০.২৪	৫.৮১

জনশুমারি

ক্র. নং	প্রধানসূচক	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২	আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
১০	বিদ্যুৎ সুবিধার প্রধান উৎস (%)		
	জাতীয় গ্রিড	৯৭.৬১	-
	সৌর বিদ্যুৎ	১.৪৫	-
	অন্যান্য	০.১৯	-
	বিদ্যুৎ সুবিধা নেই	০.৭৫	-

জনশুমারি

❑ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর ফলাফল (সংশোধিত)

- ✓ মোট জনসংখ্যা - ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন
- ✓ পুরুষ ও নারীর অনুপাত - ৯৮:১০০
- ✓ জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.) - ১১১৯ জন
- ✓ মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী - ১৬,৫০,১৫৯ (মোট জনসংখ্যার ১.০%)
- ✓ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১.২২%
- ✓ সাক্ষরতার হার - ৭৪.৬৬%

জনশুমারি

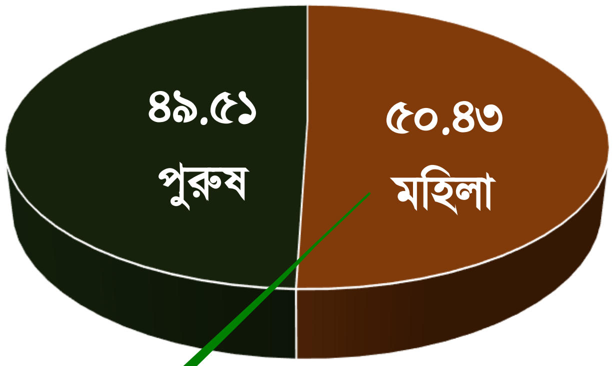

লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা

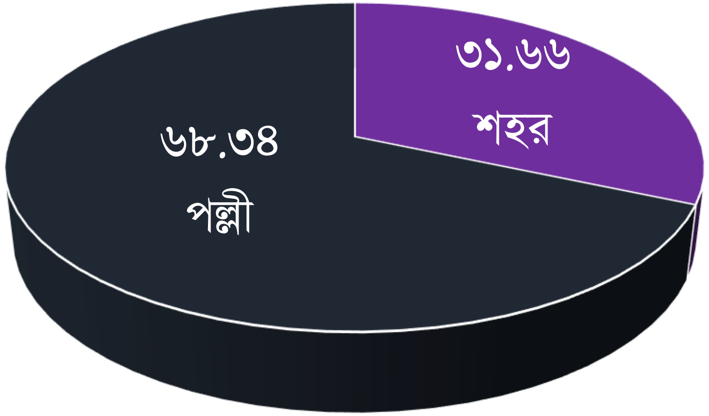

পল্লি ও শহর অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা হার

জনশুমারি

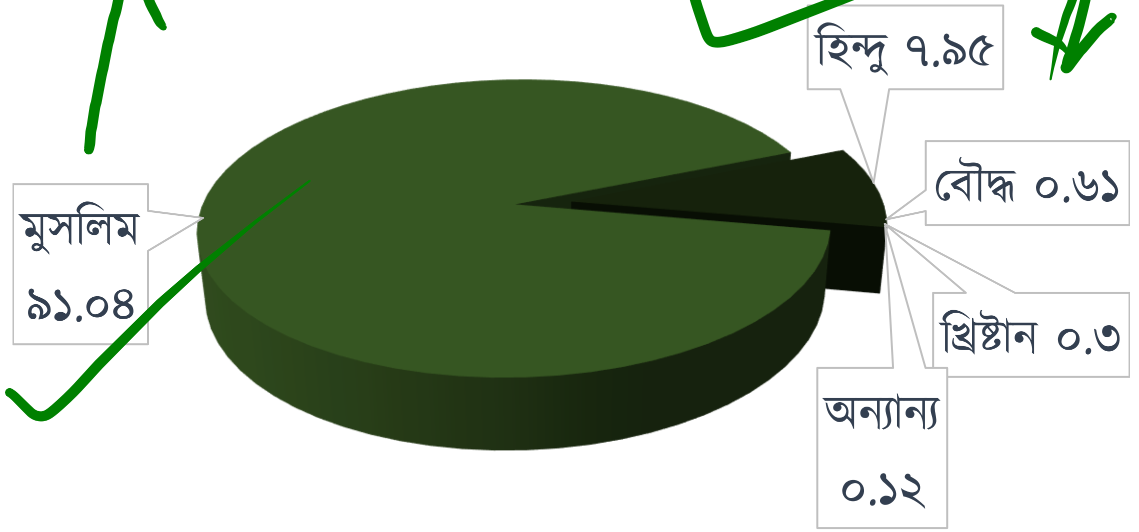

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা হার

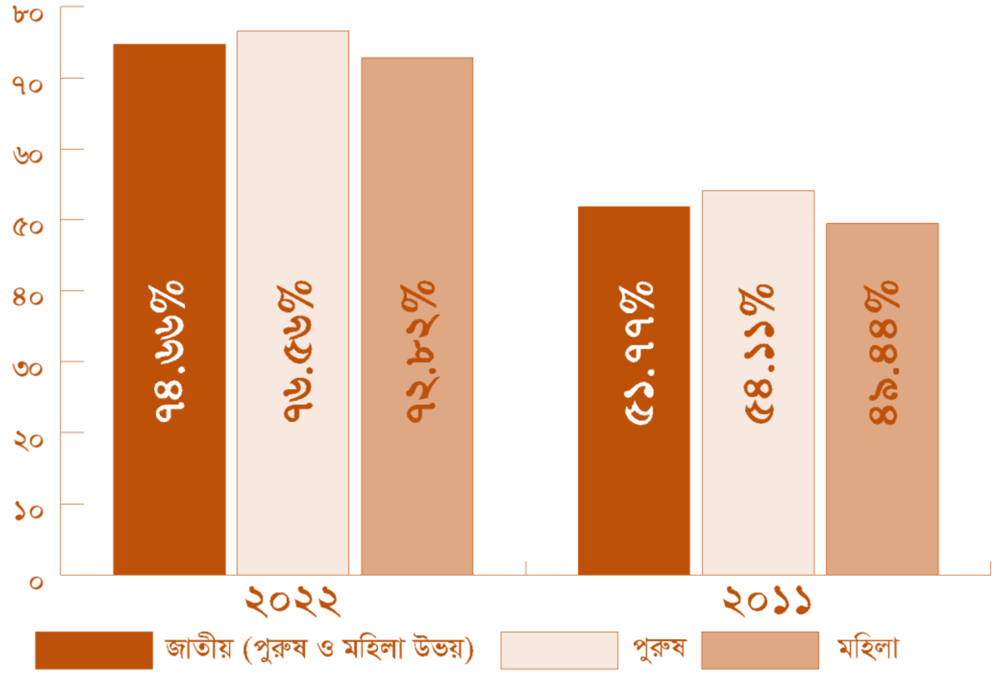

সাক্ষরতার হার (%) ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব

বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয়

বাংলাদেশে আগত জাতিগোষ্ঠীসমূহ

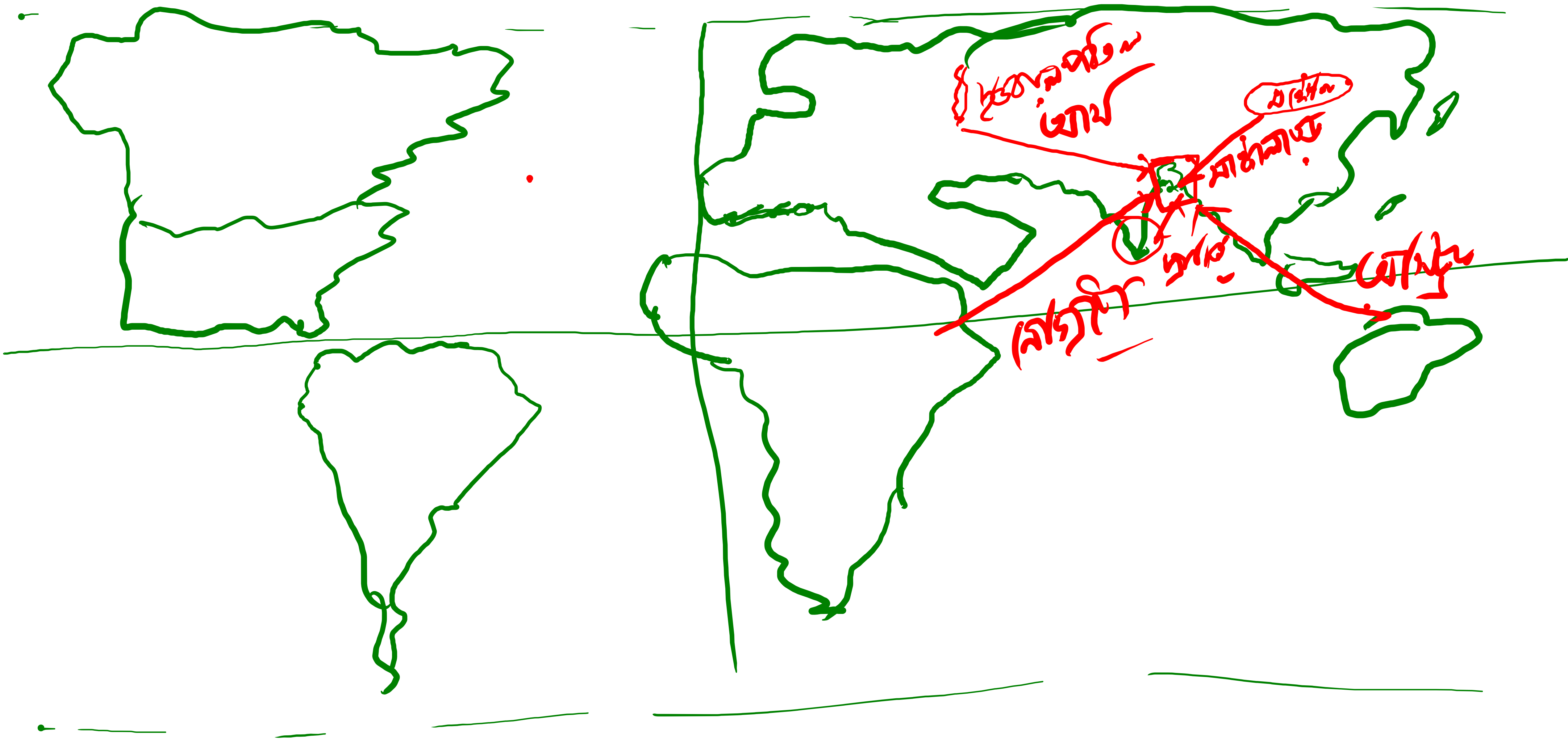
উত্তর পশ্চিম
আর্য
নেগ্রিটো
দ্রাবিড়
অস্ট্রিক

প্রশ্ন:
✓ সংকর জাতি আলোচনা

অনার্য

- অস্ট্রিক
- নেগ্রিটো
- দ্রাবিড়
- মোঙ্গোলয়েড
- ✓ ভোট চীনীয়
- ✓ আলপাইন

আর্য — ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবার

সংস্কৃতি

নৃবিজ্ঞানী এ.এল. ক্রোবার A. L. Kroeber ও ক্লাইড ক্লকন Clyde Kluckhohn ১৯৫২ সালে সংস্কৃতির ১৬৪টি সংজ্ঞা লক্ষ করেন। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করি। আধুনিক সমাজ ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলরের মতে,

"Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and other capabilities acquired by man as a member of society."

সংস্কৃতি

বাংলাদেশের মূলধারা সংস্কৃতি

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত: বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। হঠাৎ কোনো দৈব ঘটনার মাধ্যমে এ সংস্কৃতি চালু হয়নি।

লালিত ঐতিহ্য: বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে টিকে আছে। আদিম মূল আকড়ে ধরে এ সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিবর্তনশীলতা: পরিবর্তনশীলতা যেকোনো সংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে কোনো সংস্কৃতিই পরিবর্তনশীল। সময়ের ব্যবধান এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির আচার রেওয়াজ পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল।

মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন: বাংলাদেশ যে মৌলিক সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবর্তন নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল বিষয় হলো বাঙালি সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি

সংকর সংস্কৃতি: বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি সংকর সংস্কৃতি। প্রাচীন কাল থেকে এই ভূখণ্ডে আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গল, আফগান, শিখ, পর্তুগিজ, ফরাসি ইংরেজসহ নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আগমন ঘটেছে। এসব জাতির আগমনের ফলে এদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি একটি সংকর সংস্কৃতি।

সাংস্কৃতিক ঐহিত্য: বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে এক সাংস্কৃতিক ঐহিত্য যা একে অন্য সংস্কৃতি থেকে আলাদা করেছে। আমরা জানি ভাষা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরাই ভাষার জন্য লড়াই করেছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ব্যবধান: বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধান বিদ্যমান। শিক্ষার প্রসার, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ, মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধান বিদ্যমান।

সংস্কৃতি

আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব: বাংলাদেশের সংস্কৃতি আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। নানা ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন- ফেইসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদির প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পর্কের ধরন আগের তুলনায় পাল্টে গেছে।

বিশ্বায়নের প্রভাব: বিশ্বায়নের প্রভাবে অন্যান্য সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের সংস্কৃতির উপাদানে পরিণত হচ্ছে।

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

উপজাতিদের অবস্থান

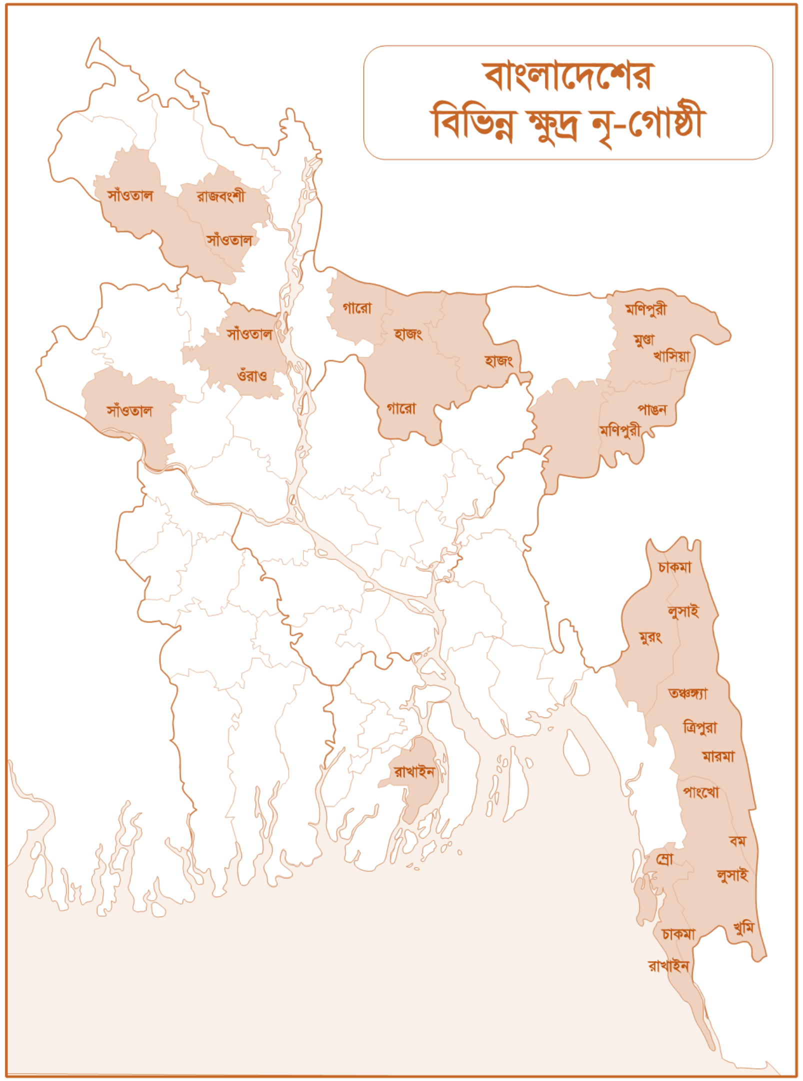

উপাদান

✓ মাংস → পেশী, যকৃত, কলিজা, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়. রাষ্ট্র গঠন এবং পানি

ডিম. ✓ ডাল, ✓ ছোলা

✓ দুধ, দই :: ঐ দুধ.

পাস্তুরিত

মাখন

সমতল:

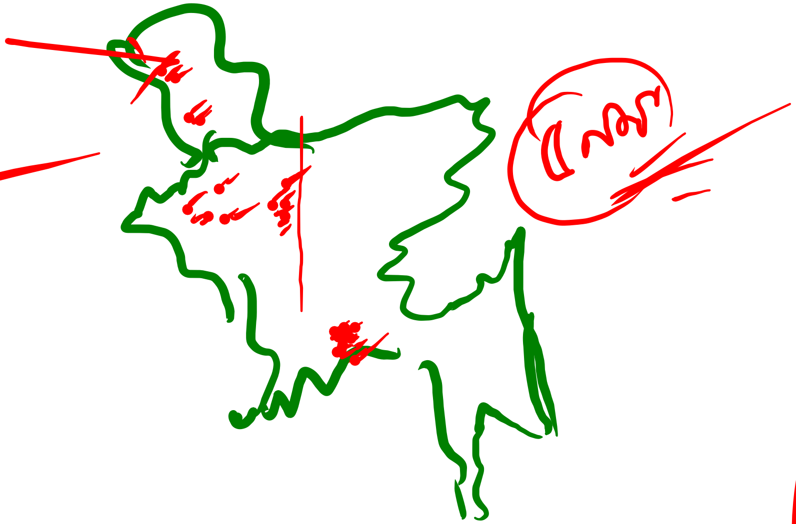

পাহাড়ি অঞ্চল

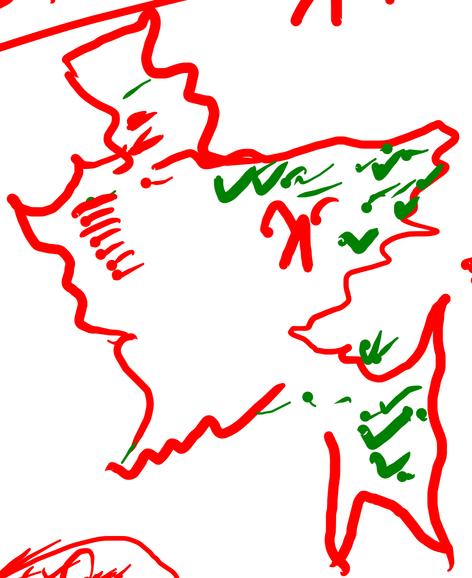

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

চাকমা

জনসংখ্যা - ৪,৮৩,২৯৯ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার।

ইতিহাস - ১৫৫০ সালের একটি পর্তুগিজ মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর তীরে চাকমা বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এরও আগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত মত হলো চাকমা জাতিগোষ্ঠী মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে আদি নিবাস স্থাপন করেছিল।

রাজনৈতিক সংগঠন - ১৭৮৭ সালে কোম্পানির সাথে চাকমা রাজা জানবক্স খানের চুক্তি অনুযায়ী চাকমা অঞ্চল বৃটিশ কোম্পানির অধিভুক্ত না হয়ে ট্রিবিউটারি হয়ে থাকার সুযোগ পায়। ১৮৫৭ সালে কোম্পানি থেকে বৃটিশ রাজার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে চাকমা এলাকা আরও বিস্তৃত করা হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে (চাকমা, মং ও বোমাং) ভাগ করা হয় যেখানে চাকমাই সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল।

ধর্ম - বৌদ্ধ (আদি থেরবাদী ও বর্তমান মহাযানী বৌদ্ধত্ব)

ভাষা - চাঙমা বা চাকমা ভাষা। নিজস্ব লিপি আছে। ইউনিকোডে লেখা যায়।

উৎসব - বিজু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ঘরে ঘরে চাকমাদের মধ্যে গঙ্গাপূজা এবং লক্ষ্মীপূজার প্রচলন রয়েছে। গোজেন নামের ঈশ্বরকে তারা খুব ভক্তি করে। তারা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ও ফসল রক্ষার জন্য মোরগ ও শূকর বলিদান করে পূজা অর্চনা করে। চাকমাদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব মাঘীপূর্ণিমা আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়।

ตลาด. 3ภาค มนุษย์ ?

- ตลาด → เสาร์
- ราคา
- มาตร
- มาวอ่าย
- สุนทว่ง / โครงร

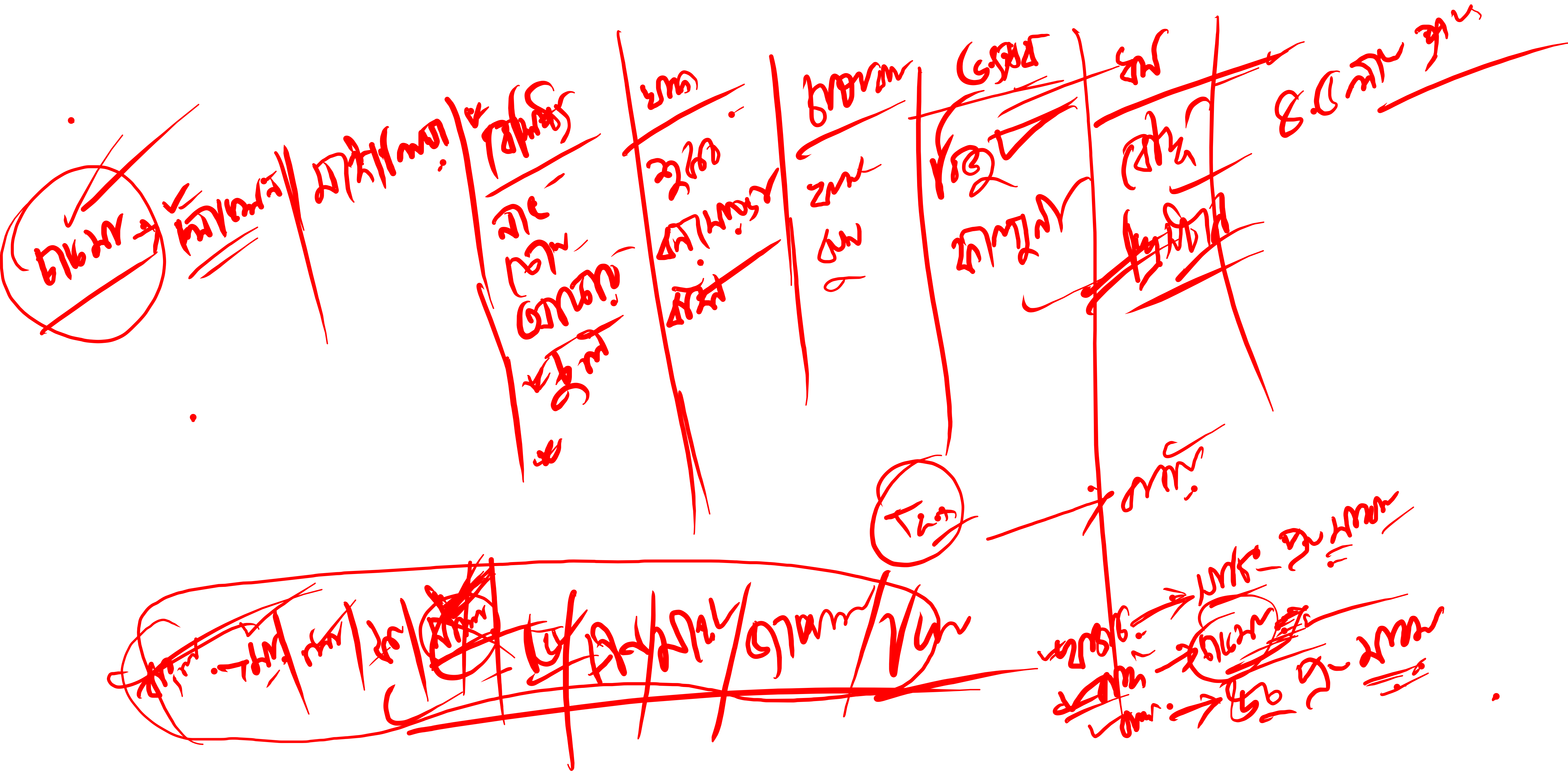

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

সাঁওতাল

জনসংখ্যা - ১,২৯,০৪৯ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)
বসতি - রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া।
ধর্ম - সনাতন ও খ্রিষ্টান
উৎসব - সান্দ্রে, সোহরাই

তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। প্রায় প্রতিমাসে বা ঋতুতে রয়েছে পরব বা উৎসব যা নৃত্যগীতবাদ্য সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নববর্ষের মাস ফাল্গুনে যেমন অনুষ্ঠিত হয় স্যালসেই উৎসব, তেমনি চৈত্রে বোঙ্গাবোঙ্গি, বৈশাখে হোম, আশ্বিনে দিবি, পৌষ শেষে সোহরাই উৎসব পালিত হয়। সোহরাই উৎসব সাঁওতালদের একপ্রকার জাতীয় উৎসব যা পৌষ সংক্রান্তির দিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

মারমা

জনসংখ্যা - ২,২৪,২৬১ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)
বসতি - বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি।
ধর্ম - বৌদ্ধ
উৎসব - তাদের নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানকে সাংগ্রাই বলা হয়।

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধ বিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধভিক্ষু "ভান্তেদের" অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলোতে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের বন্দনা করে থাকে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মত মারমারাও Theravada Buddhism-এ বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করে থাকে।

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

রাখাইন

জনসংখ্যা - ১১,১৯৫ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা।

ধর্ম - বৌদ্ধ

উৎসব - জলকেলি

রাখাইনদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে জলকেলি উৎসব। এপ্রিল মাসে নববর্ষের প্রাক্কালে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তিন দিন ধরে এ উৎসব উদযাপন করা হয়। তারা বসন্ত উৎসবও পালন করে থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি রাখাইনরা যাদুবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি এবং নানাবিধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিক ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন রাখাইন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

গারো

জনসংখ্যা - ৭৬,৮৪৬ (জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)

বসতি - টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর।

ধর্ম - খ্রিষ্টান

উৎসব - ওয়ানগালা

গারোদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ওয়ানগালা। 'ওয়ানা' শব্দের অর্থ দেব-দেবীর দানের দ্রব্যসামগ্রী আর 'গালা' শব্দের অর্থ উৎসর্গ করা। এটি গারোদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। সাধারণত বর্ষার শেষে ও শীতের আগে, নতুন ফসল তোলার পর এ-উৎসবের আয়োজন করা হয়। এর আগে গারোদের নতুন খাদ্যশস্য ভোজন নিষেধ থাকে। উৎসর্গ পর্বটি ধর্মীয় দিক আর ভোজ, নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ ও সম্মিলনের দিকটি সামাজিক দিক। তবে গারোদের কাছে ওয়ানগালার মূল বিষয়টি ধর্মীয়। পূজা-অর্চনার মাধ্যমে দেব-দেবীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নানা আবেদন-নিবেদন করা হয় এ-উৎসবে। একারণে অনেকেই এটিকে নবান্ন ও ধন্যবাদের উৎসবও বলে থাকে।

উপজাতিদের অবস্থান ও সংস্কৃতি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতির কেন্দ্র

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা
মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	বিরিশিরি, নেত্রকোণা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি	১৯৭৮
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	১৯৯৪
ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	রাজশাহী	–
রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	–

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ

ময়নামতি, কুমিল্লা

কুমিল্লার ময়নামতি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কুমিল্লা জেলা শহরের সাত কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়ি এলাকায় বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি অবস্থিত। এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে ময়নামতির শালবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। সমগ্র প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাটি ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় ১১ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। শালবন বিহারের সন্নিকটে স্থাপিত যাদুঘরে ময়নামতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়েছে।

অষ্টম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধদেব ময়নামতি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন বলে ধারণা করা হয়। ৯ম ও ১০ম শতকে এ অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন রাজা মানিক চন্দ্র। মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর রানি ময়নামতি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করেন। রানি ময়নামতির নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ করা হয় ময়নামতি।

ময়নামতির প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, রানি ময়নামতির প্রাসাদ, আনন্দ বিহার। প্রাচীন এই নিদর্শনে তাম্রফলক, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, ব্রোঞ্জ নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি, বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, রাজপরিবারের ব্যবহৃত তৈজসপত্র পাওয়া গিয়েছে। ময়নামতির সভ্যতা ধ্বংসের প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। এখানে কোনো রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, ব্রাহ্মণ ধর্মের পুনর্জাগরণের সময় এ বৌদ্ধসভ্যতাটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং কালক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ

মহাস্থানগড়, বগুড়া

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ নগরী পুণ্ড্রনগরের অবস্থান। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকে মহাস্থান ব্রাহ্মলিপিতে 'পন্দনগল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, এ পুন্দনগলই হচ্ছে প্রাচীন পুণ্ড্রের রাজধানী পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়। মৌর্য সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং এর বর্ণনায় পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকেই আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানকে পুণ্ড্রনগর বলে চিহ্নিত করেন। ১৯৩০ সালে ব্রাহ্মী অক্ষরে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আজকের মহাস্থানগড়ই বাংলার প্রাচীনতম শহর 'পুণ্ড্রনগর'।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে পুণ্ড্রনগরে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে 'পুণ্ড্র' হয়ে ওঠে 'পুণ্ড্রবর্ধন'। পুণ্ড্রবর্ধনের বিস্তৃত ছিল বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জুড়ে। দশম শতকে এ অঞ্চল 'বরেন্দ্র' বা 'বরেন্দ্রী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন শাসকবর্গ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। সামগ্রিকভাবে এখানে গড়ে ওঠে এক সমৃদ্ধ জনপদ। আর্যদের আগমনের আগে পুণ্ড্রনগরে 'পুণ্ড্র' নামের আদিবাসীরা বাস করত। বৌদ্ধসভ্যতার প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ এই পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও বিভিন্ন হিন্দু সামন্তরাজাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধতম মত হচ্ছে, পাল রাজাদের রাজত্বকালেই (৭৫০ খ্রি. থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) মহাস্থানগড় বা বরেন্দ্র সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ

পাহাড়পুর, নওগাঁ

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবিস্থত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় পাহাড়পুরের অবস্থান। পাল রাজত্বের প্রথম ভাগে ৮ম শতকের শেষভাগে পাহাড়পুরের বিখ্যাত মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা ধর্মপাল ও তাঁর পুত্র দেবপালদের সময়ে বাংলাদেশে বহু বৌদ্ধবিহার ও মন্দির নির্মিত হয়। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতা ৮ম থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল বলে অনুমান করা হয়। পাহাড়পুরের প্রধান মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে সেই ইটের স্তুপের উপর ধূলাবালি ও মাটি ইত্যাদি জমে কালক্রমে এক উঁচু পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের মতো উঁচু হওয়ার কারণেই এ এলাকার নামকরণ হয়েছে পাহাড়পুর।

পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে সোমপুর বিহার, স্নানঘাট, গন্ধেশ্বরী মন্দির, সত্যপীরের ভিটা। প্রাচীন এই নগরীতে খনন কার্য চালিয়ে দেবদেবীর বিষ্ণু মূর্তি, পাল রাজাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুরে বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতার নিদর্শনসমূহের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পোড়ামাটির ফলক-চিত্রের রাজকীয় শিল্পবোধের বদলে লোকমানসের চরিত্র অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, মুনির ঘুন, পরশুরামের প্রাসাদ, খোদাই পাথর ভিটা, মানলাকির কুণ্ড, শীলাদেবীর ঘাট, লক্ষীন্দর মেধ- প্রাচীন এই সভ্যতার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এখানে প্রাপ্ত প্রাচীনযুগের নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বিষ্ণু পাথরের দেবদেবীর মূর্তি, ব্যবহার্য তৈজসপত্র, পোড়া মাটির খেলনা, স্বর্ণ ও রূপার গহনা। এছাড়াও এখানের স্থাপনার দেয়ালে বিভিন্ন প্রাচীন চিত্রকর্ম পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ

উয়ারি-বটেশ্বর, নরসিংদী

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদী জেলার বেলাবো ও শিবচর উপজেলার ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে উয়ারি এবং বটেশ্বর গ্রামের অবস্থান। উয়ারি ও বটেশ্বর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ভিন্ন গ্রাম হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে একসাথে উচ্চারণ করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে একটি দুর্গ নগর হিসেবে উয়ারি-বটেশ্বর আত্মপ্রকাশ ঘটে বলে ধারণা করা হয়। গ্রিক-রোমান গণিতবিদ টলেমি তাঁর 'জিওগ্রাফিয়া' গ্রন্থে উয়ারি-বটেশ্বরকে 'সোনাগড়া' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডেও অনুরূপ কিছু প্রাচীন বাণিজ্যিক নগরীর উল্লেখ করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এই জনপদে ২৫০০ বছর পূর্বে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির স্ফূরণ ঘটেছিল। কিন্তু এ সভ্যতা আধুনিক গ্রামীণ সভ্যতার নিচে চাপা পড়েছিল দীর্ঘকাল। ১৯৩৩ সালের দিকে নরসিংদীর এই স্থানে প্রাচীন কোনো সভ্যতা আছে বলে ধারণা করা হলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ২০০০ সালে খনন কাজ শুরু হয় এবং প্রাচীন এই নগরী আবিষ্কৃত হয়।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ

এই জনপদে এখনো পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যার মধ্যে রঙেরটেক, সোনারুটলা, কেন্দুয়া, মরজাল টঙ্গী রাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, চণ্ডীপাড়া, জয়মঙ্গল, কুণ্ডাপাড়া ও গোদাশিয়া উল্লেখযোগ্য। খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রাচীন দুর্গনগরী, বন্দর, রাস্তা, ঘরবাড়ি, টেরাকোটা, বৌপ্যমুদ্রা, হাতের কাজ করা ধাতব সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। উয়ারি-বটেশ্বর থেকে চার কিলোমিটার দূরে মন্দিরভিটা নামক একটি বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য আরেকটি গ্রামেও এরূপ আরেকটি বৌদ্ধ মন্দির পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। এটি একাধারে প্রাচীন দুর্গনগরী এবং বাণিজ্য-নগরী হিসেবে স্বীকৃত। কৃষির পাশাপাশি এখানে নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগ, জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসাবাণিজ্য এবং বন্দরভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। মুদ্রা অর্থনীতি ও কৃষি বহির্ভূত পেশার চর্চা উয়ারি-বটেশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইটের ব্যবহার, পাকা রাস্তা, প্রাচীর ও পরিখা উন্নত নগর সভ্যতার পরিচায়ক। বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার বিকাশ হয়েছে পনের শতকের পর। কিন্তু আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ঢাকার অদূরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বন্দর ও বাণিজ্য নগরী। দুর্গ ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকেই এ নগরীর সমৃদ্ধি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

বাংলার প্রাচীন জনপদ

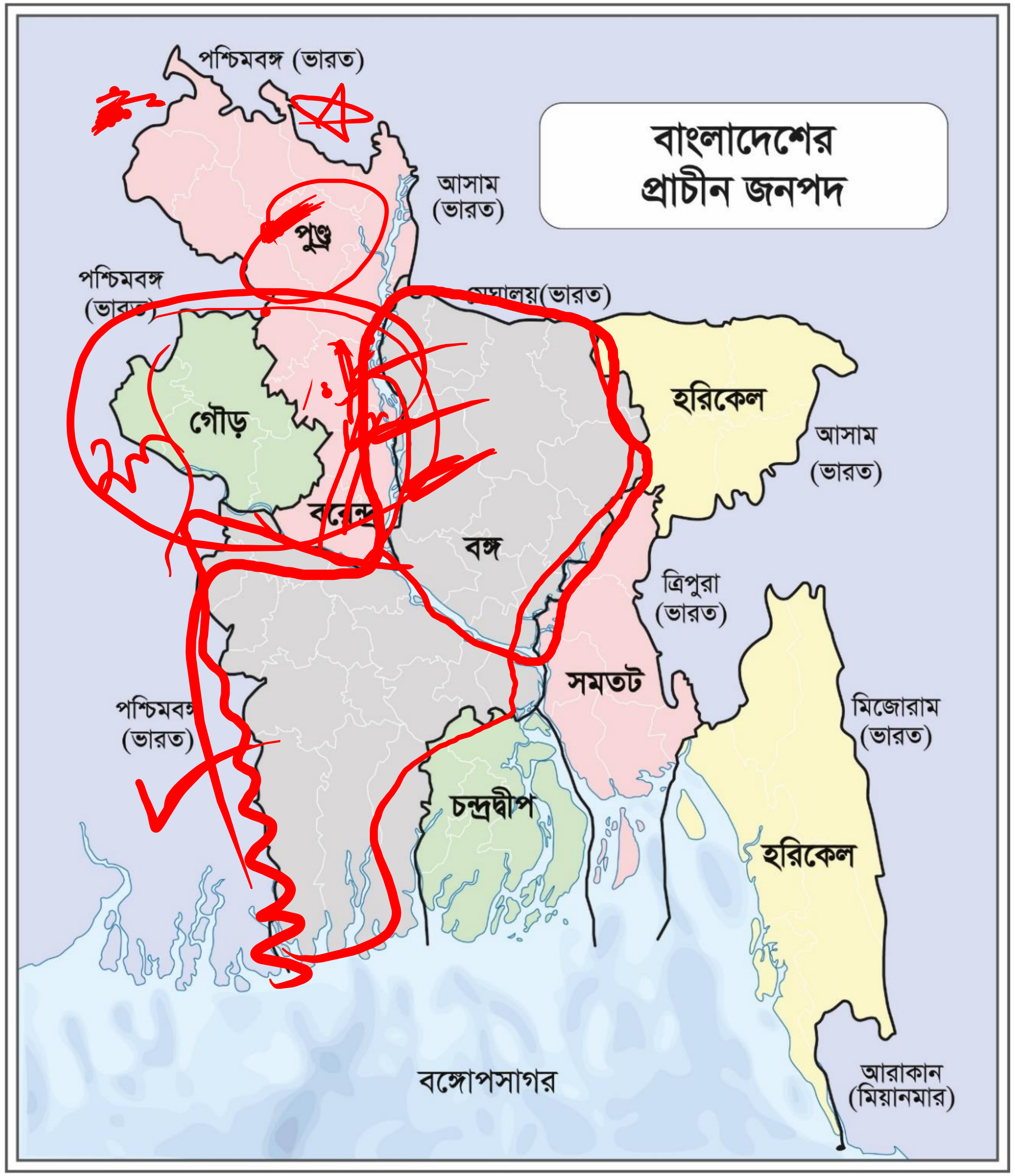

বাংলার প্রাচীন জনপদ

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল	বিশেষত্ব
গৌড়	উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল,আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন শশাংক।
বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি, বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ	বর্তমান ঢাকা এই জনপদের অংশ ছিল
পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা	বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ। রাজধানী ছিল পুণ্ড্র নগর/পুণ্ড্র বর্ধন।
হরিকেল	সিলেট ও চট্টগ্রামের অংশবিশেষ	
রাঢ়	ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর	এর অপর নাম সূহ্ম
সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী	রাজধানী ছিল বড় কামতা (রোহিতগিরি)
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলা জুড়ে	
তাম্রলিপি	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা	
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল	
বরেন্দ্র	গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল	

মুঘল শাসন : সুবাহ বাংলা

বারোভূঁইয়া

সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদার মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন । বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত। এ 'বারো' বলতে বারোজনের সংখ্যা বোঝায় না। ধারণা করা হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই 'বারো' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে বারোভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোলো শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। আলোচ্য সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁরাই 'বারোভূঁইয়া'। এছাড়াও, বঙ্গদেশে আরও অনেক ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। তাঁরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। কিন্তু পরে তাঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

মুঘল শাসন : সুবাহ বাংলা

বারোভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

বারোভূঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম
ঈসা খাঁ, মুসা খাঁ	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
বাহাদুর গাজি	ভাওয়াল
সোনা গাজি	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)
ওসমান খাঁ	বোকাইনগর (সিলেট)
বীর হামির	বিষ্ণুপুর (বাকুড়া)
লক্ষণ মাণিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বিনোদ রায়, মধু রায়	চালপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশবিশেষ

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ

পলাশির যুদ্ধ

যুদ্ধের কারণ

সিরাজের বিরুদ্ধের ষড়যন্ত্র: সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণকে আলীবর্দী খানের অপর দুই কন্যা সহজে মেনে নিতে না পেরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। এতে ইন্ধন যোগায় ঘষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। সিরাজউদ্দৌলা কৌশলে তাঁর খালা ঘষেটি বেগমকে প্রাসাদে নজরবন্দি করেন ও খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নতুনভাবে শুরু হয়।

নবাবের আদেশ অমান্য: নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে ইংরেজগণ বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায়নি। কিন্তু সিরাজের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কোলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দনগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফরাসিরা এ আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ

ইংরেজ কর্তৃক শওকত জঙ্গকে সাহায্য: নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে খালা ঘষেটি বেগম ও পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন করেন। এতে নবাব ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট হন।

ইংরেজ কর্তৃক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান: ঘষেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বনকারী রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ও তাঁর পরিবার প্রচুর ধনদৌলতসহ কোলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব সরাসরি কৃষ্ণদাসকে তাঁর নিকট সমর্পণের জন্য নারায়ণ সিংহকে দূত হিসেবে ইংরেজদের কাছে পাঠান। কিন্তু, ইংরেজ গভর্নর নবাবের দূতকে অপমানিত করে বের করে দেন ও কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। ফলে নবাবের ধৈর্যের বাধন ছিঁড়ে যায়।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র: ইংরেজদের একের পর এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অবাধ্যতা নবাবকে ক্ষুব্ধ করে তোলে । তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৭৫৬ সালের জুন মাসের শুরুতে নবাব কোলকাতা দখল করে নেন। যাত্রাপথে তিনি কাশিম বাজার কুঠিও দখল করেন । নবাবের অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। হলওয়েলসহ বেশকিছু ইংরেজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় । বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নবাবকে হেয় করার জন্য হলওয়েল এক মিথ্যা প্রচারণা চালায় যা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত ।

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কতৃত্ব লাভ

এতে বলা হয় যে, ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ১৪.১০ ফুট প্রস্থ ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয় । এতে প্রচণ্ড গরমে শাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। এই মিথ্যা প্রচার মাদ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায় । ফলে উত্তেজিত হয়ে কোলকাতা দখল করার জন্য ওয়াটসন ও ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় চলে আসে। তারা নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদকে পরাজিত করে কোলকাতা দখল করে নেয় । নবাব তাঁর চারদিকে ষড়যন্ত্র ও শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নতজানু ও অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন । এটি ইতিহাসে 'আলীনগর সন্ধি' নামে খ্যাত ।

আলীনগর সন্ধিতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পর ক্লাইভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি পায়। নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপে সংঘটিত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দনগর কুঠি দখল করে নেয় । নবাব এ অবস্থায় ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ইংরেজদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন । এতে ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হয়ে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় । এই ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, প্রধান সেনাপতি মীর জাফর প্রমুখ ।

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পারিন কতৃত্ব লাভ

নবাবের পতনের কারণ

পলাশির যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল-

- মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পতনের প্রধান কারণ। বিজয়ের মুহূর্তে প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে নবাবকে ভুল পরামর্শ দেয় ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।
- তরুণ নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যাধিক স্নেহ প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায় সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বিপদজ্জনক পরিস্থিতির মুখে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দুর্বলতার কারণে কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্দত হন নি।
- যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তাঁর সমরনীতির অপরিপক্কতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে যা তাঁর পতনকে তরান্বিত করে।
- সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক রবার্ট ক্লাইভ সূক্ষ্ম কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্ভারে নবাব অপেক্ষা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবধারিত ছিল।

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পারিন কতৃত্ব লাভ

পলাশির যুদ্ধের ফলাফল

উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ একটি বেদনাবহুল খণ্ড যুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সদুর প্রসারী। বিশেষ করে, এ যুদ্ধের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

- পলাশির যুদ্ধের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে মীরজাফর নামেমাত্র নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা রইলো ক্লাইভের হাতে।
- পলাশির যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছ থেকে নগদ এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারী লাভ করেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেন আর এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।
- যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজরা বাংলাসহ দাক্ষিণাত্যে হতে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।
- ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার বলেন, "পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কালক্রমে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি:) তারা নবাব মীর কাসিম ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে পরাজিত করে সমগ্র উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে।"
- যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং একইসাথে কোম্পানির মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।
- পলাশির যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে উপমহাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ

দ্বৈত শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

পলাশির যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস শুরু করেছিল, তাদের দেওয়ানি ও দ্বৈত শাসন লাভের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। লর্ড ক্লাইভ এদেশে এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা চালু করেন যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোম্পানিকে শক্তিশালী করে সম্রাট ও নবাবকে ক্ষমতাহীন করে তোলা। এতে দেওয়ানি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। এরই নাম দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি পেলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর নবাব পেলো ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে এনেছে বেশি। ক্ষমতা পেয়েই কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের মানুষের উপর রাজস্বের জন্য নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে। কিন্তু নবাবের হাতে কোনো ক্ষমতা না থাকায় এর বিচার সম্ভব হয়নি। ফলে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের দারুন ক্ষতি হয়। সামগ্রীকভাবে কৃষির অবনতি, উপরন্তু অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সনে) দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়, যার প্রেক্ষিতে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ

রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থাপনা: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২শে মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের নিজ নিজ জমির ওপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে বন্দোবস্ত চালু করা হয়, তাকেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলা হয়।

গভর্নর হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৭৭২ সালে পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চহারে ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় ও সময়সীমা থাকায় জমিদারগণ প্রজা পীড়ন করত কিন্তু উন্নয়ন করত না। ফলে কৃষকগণ জমি চাষ না করায় তা বছর ধরে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকত ও জমির দাম কমে যেত। এসব কুফল দেখা দেয়ায় হেস্টিংস জমিদারগণের সাথে 'একসালা' ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু এতেও সরকার, জমিদার ও প্রজাদের অসুবিধা দেখা দেয়ায় কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন (১৭৮৯ খ্রি:)। কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর অনুমোদন লাভের পর কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। ১৭৬০ সালে প্রথম ফকিরদের নেতা মজনু শাহ ও সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বক্সারের যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাব মীর কাশেমের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৭৭১ সালে মজনু শাহ উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭-১৭৮৬ সাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সঙ্গে মজনু শাহ বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর যুদ্ধকৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি অর্থাৎ অতর্কিত আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। ১৮০০ সালে তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

তিতুমিরের সংগ্রাম

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তার দুইটি ধারা প্রবহমান ছিল। যার একটি ওয়াহাবি বা মুহাম্মদিয়া আন্দোলন, অপরটি ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ নির্দেশ করা। বাংলার ওয়াহাবিরা তিতুমিরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমিরের নেতৃত্বে পরিচালিত তারিখ-ই-মুহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলন পরবর্তীতে কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়।

১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন জমিদারদের আতে ঘা লাগায় তা এক সময় জমিদার বিরোধী আন্দোলন এবং পরে তা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। এই সংগ্রামে তিতুমীর ও তার অনুসারীরা পরাজিত হলেও তা উপমহাদেশের শোষিত শ্রেণির মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

নীল বিদ্রোহ

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে নীল চাষ শুরু হয়।

নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীল চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশপরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ সালে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেণী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই।

কৃষকের আন্দোলনের সাথে যোগ দেয় শিক্ষিত সমাজ; দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ সালে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ফরায়েজি আন্দোলন

ওয়াহাবি মতাদর্শে বিশ্বাসী হাজী শরীয়তুল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজি আন্দোলন'। 'ফরায়েজি' শব্দটি এসেছে 'ফরজ' শব্দ থেকে। 'ফরজ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অবশ্য পালনীয়।' তিনি তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে মুসলমানদের 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনে আহ্বান জানান। কেননা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ লক্ষ্য করেন যে, মুসলমান জনগণ পীরপূজা, পীরের দরগায় ওরশ, মানত পালন এবং কবর পূজায় লিপ্ত। মুসলমানদের এসব ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচার এবং নৈতিক অধঃপতন হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌কে বিচলিত করে তোলে। তিনি এসব পালনের ঘোর বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ ভারতে বিদেশি ও বিধর্মী ইংরেজ রাজত্বকে 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমানদের পাঁচটি ফরজ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। এজন্যই তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজি আন্দোলন'। ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আবরণে একটি সংস্কার আন্দোলন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আহ্বানে ফরিদপুর ও তার আশেপাশের কারিগর, কৃষক, তাঁতি, জেলে সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। তিনি লক্ষ করেন যে, এসব নিম্নবিত্তের মানুষদের উপর অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর ইংরেজ সাহেবরা নির্যাতন ও শোষণ চালাচ্ছে। কাজেই তিনি এ শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। ফলে তিনি ধর্মীয় নেতা হলেও তাঁর উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায়। তিনি জনগণকে জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। কিন্তু শক্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের প্রবল আক্রমণের মুখে হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ফরায়েজি আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

সিপাহি বিদ্রোহ

ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। কিন্তু এতে সামগ্রিকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব এত ব্যাপক আকারে ঘটে যে তা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে কোম্পানির দুঃশাসন ও নির্যাতনের শিকার দেশীয় সিপাহিরা এ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। পরবর্তীতে তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক বছর কাল স্থায়ী এই গণবিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ অংশ নেয় ও সহযোগিতা প্রদান করে। বিদেশি শাসন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের মূলে কাজ করেছিল। বিপ্লবী জনতা বৃটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক বলে ঘোষণা দেয়। তা ছাড়া নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ, কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমদ উল্লাহ প্রমুখ নেতা গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে বিপ্লব সফল না হলেও পরিণতিতে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ রাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

কারণ

- **রাজনৈতিক কারণ:** লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি এবং অধীনতামূলক নীতি উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে বিদ্রোহের সঞ্চার করে। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা তিনি সাঁতারা, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও নাগপুর রাজ্য দখল করেন। অযোধ্যা রাজ্যটি কুশাসনের অভিযোগে গ্রাস করা হয় এবং অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার সাথে দখলকৃত অযোধ্যা ও নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা হয়। এর ফলে নানা সাহেব ও ঝাঁসির রাণি বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং সাঁতারা ও নাগপুরের রাজপরিবারগুলো বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

- **অর্থনৈতিক কারণ:** ইংরেজ কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর সেখানকার বহু তালুকদার জমির মালিকানা হারান। শুধু অযোধ্যা নয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা লাভের পর দেওয়ানী অর্থ উত্তোলনের পাশাপাশি এখানকার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে যা এখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। এতে ভারতের মানুষ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

- **সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণ:** শাসক ও শাসিত শ্রেণির মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকায় এখানকার হিন্দু-মুসলিম বিরোধী আইনগুলোকে ভারতের মানুষ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবে দেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । এছাড়া ভারতবাসীদেরকে ইংরেজরা তাদের অন্যান্য উপনিবেশের মতো খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করত যা ভারতবাসীর আক্রোশ আরো বৃদ্ধি করেছিল।

- **সামরিক কারণ:** সিপাহি বিপ্লবের অন্যতম কারিগর সিপাহিদের অসন্তোষ ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতে কোম্পানির শাসন বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়োজিত সৈনিক বেশিরভাগই ছিলেন ভারতীয় কিন্তু তাদের বেতন ভাতা ইউরোপীয়দের তুলনায় ছিল অনেক কম। তাছাড়া ভারতীয় সিপাহিদের প্রতি ইংরেজ অফিসারদের অসদাচরণ ছিল আরেকটি অন্যতম কারণ। সে সময় রয়েল এংফিল্ড রাইফেলের গ্রিজ হিসেবে গরু ও শুকরের চর্বি ব্যবহার করা হয় বলে গুজব রটে; যা হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সৈনিকদের মধ্যে ক্ষোভ চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

ফলাফল

১৮৫৭ সালের জুলাইতে ইংরেজরা কানপুর দখল করে নেয় এবং নানা সাহেবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। এসময় ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় লর্ড ক্যানিং সরাসরি বিদ্রোহের সাথে জড়িত নয় এমন ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে মেজর হাডসন দিল্লি দখল করে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে মিয়ানমারের রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন; যদিও তার ছেলেদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জুনে ঝাসি দখল করে ঝাসির রানি লক্ষীবাঈকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বিদ্রোহের সাথে জড়িত সৈনিকদের বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আগস্টে রানি ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শত বছর শাসনের অবসান হয়।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে ব্যর্থ হয়। এ বিপ্লবের পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ঐক্যবদ্ধ কোনো কর্মপন্থা বা সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। দুর্বল নেতৃত্ব, আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাব, নিম্নমানের সমরাস্ত্র ও দুর্বল রণকৌশল বিদ্রোহীদের পরাজয়কে অবধারিত করে তোলে। অন্যদিকে ইংরেজদের দক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত সামরিক শক্তি তাদের মাথায় বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

বঙ্গভঙ্গ

১৯০৫ সালের পূর্বে 'বাংলা প্রেসিডেন্সি' ছিল ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। এই বৃহৎ প্রদেশটিকে ভেঙে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। ঢাকায় এ নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। এর রাজধানী হয় কলকাতা। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হয়। বঙ্গভঙ্গের পর নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন এনড্রু ফ্রেজার। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণকে সংগঠিত করেন।

বঙ্গ প্রেসিডেন্সি = ১৯০৫

- পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ
  - প.বঙ্গ (রাজধানী)
  - বিহার
  - উড়িষ্যা
- পূর্ববঙ্গ ও আসাম (ঢাকা)
  - ঢাকা
  - রাজশাহী
  - চট্টগ্রাম
  - আসাম

উদাহরণ

(১) [illegible]

(২) [illegible]

(৩) [illegible]

(৪) [illegible]

(৫) [illegible]

(৬) [illegible]

(৭) [illegible]

[illegible]

কোরআন

১ তিনজন লেখক প্রতিষ্ঠান

২ সূরাসমূহ গীতিকার

৩ অর্জন অনুবাদ রচনা

৪ চিত্রকর্ম ৩য় পালন

৫ ইহ ও মুসলিম দর্শন

১১৪ ← ২০২ = মুফাসসির

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

বঙ্গভঙ্গের কারণ

প্রশাসনিক কারণ: অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশ এর আয়তন ছিল প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এতবড় প্রদেশ শাসন করা ছিল খুবই কষ্টকর। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে এজন্যই লর্ড কার্জন ভারত সচিবকে লিখেছিলেন যে, "একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে এত বড় ও বিশাল জনবহুল এলাকা শাসন করা সম্ভব নয়।" লর্ড কার্জনের এ লিখিত রিপোর্টের আলোকেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হলে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে উঠবে এবং জনগণের দাবি ও সমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করা: ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা শহর। সুচতুর ইংরেজ সরকার এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ এবং আন্দোলনকারীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গ করতে উদ্যোগী হন এবং ব্রিটিশ সরকার 'বিভেদ ও শাসন নীতি' অবলম্বন করেন।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

মুসলমানদের দাবি: স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সুযোগ পাবে। হিন্দু সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকাতার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতাও হ্রাস পাবে। মুসলমান জনগণ চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারবে।

সামাজিক কারণ: ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমান সম্প্রদায় নির্মমভাবে শোষিত বঞ্চিত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি এবং মুসলমানদের প্রতি বৈরী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানরা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিহীন একটি দরিদ্র, রিক্ত ও নিঃস্ব সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সুতরাং লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের চিন্তা-ভাবনা শুরু হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই এর প্রতি সমর্থন জানায়। বঙ্গ বিভাগের দ্বারা পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জনগণ তাদের হারানো সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসামের ইরা পত্রিকায় নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ৮টি সুবিধার কথা উল্লেখ করে। এগুলো হচ্ছে-

- ✓ ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি;
- ✓ নদী ও খালগুলোর উন্নতি, রেল লাইনের সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে এর সংযোগ স্থাপন;
- ✓ নতুন প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিদের পক্ষে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ-সুবিধা;
- ✓ সুষ্ঠু শাসন ও জনসাধারণের জান মালের অধিকতর নিরাপত্তা;
- ✓ পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সংস্পর্শে আসায় অনুন্নত আসামের অধিবাসীদের উপকার;
- ✓ পূর্ব বাংলার জন্য কর্মদক্ষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা;
- ✓ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি;
- ✓ এক বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জনসাধারণ এখন প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসতে পারে যা পূর্বে কখনো সম্ভব ছিল না।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

রাজনৈতিক ফল

- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে রাজধানী ঢাকায়। ঢাকায় গড়ে ওঠে নতুন অফিস, সচিবালয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান।

- নবগঠিত প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে । বঙ্গভঙ্গের প্রথমবার্ষিকী মুসলমানরা পালন করে উৎসবমুখর চিত্তে। অন্যদিকে হিন্দুরা একে শোক ও বেদনার দিন হিসেবে পালন করে। এর ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে।

- মুসলমানদের নিজস্ব দল মুসলিমলীগ গঠন (১৯০৬) বঙ্গভঙ্গের অপর রাজনৈতিক ফল। এ দলের চাপের কারণেই মর্লি-মিন্টো ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করেন।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ফল

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের ভেতর গোটা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব বাংলায় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮২.৯ ভাগ যা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর উন্নতি পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অর্থনৈতিক ফল

- এসময় ব্যাপকভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পাটের দামও বেড়ে যায়। ১৯০৬-১৯০৭ সালে পাটের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৪ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে বাড়তি অর্থ আসতে থাকে। সন্দেহাতীতভাবে কৃষকদের কাছে তা বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই ধরা পড়ে যা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনে ভূমিকা রাখে।
- ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি হয়। আমদানি ও রপ্তানি উভয় বাণিজ্যেই এ বৃদ্ধি ঘটে। প্রদেশের সমুদ্র নির্ভর বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯০৫-১৯০৬ অর্থবছরে এই বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩১৭.৭৬ লক্ষ টাকা।
- প্রদেশের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবহনের উন্নয়নের দিকেও নতুন প্রশাসন দৃষ্টি দেয়। যদিও এ খাতে অধিকাংশ ব্যয় ধরা হয় পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চাৎপদ আসামে। প্রদেশের রাস্তাঘাটের জন্য ১৯১১ সালে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ রদ

স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রকট রূপ লাভের কারণে ব্রিটিশ সরকার শেষপর্যন্ত নতি স্বীকার করে। ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার পদত্যাগ করেন। ১৯১০ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের গোপন তৎপরতা চালায়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লি দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। নতুন পরিকল্পনায় বর্ধমান প্রেসিডেন্সি, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম- এই পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হবে কলকাতায়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গ রদে হিন্দুরা সন্তোষ প্রকাশ করে। জাতীয় কংগ্রেস একে স্বাগত জানায়। হিন্দু উগ্রপন্থিরা একে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমনকি কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাম রয় লিখেছেন, "১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দিয়েছে।"

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: মুসলমানরা এতে আহত হয়। তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা দেখা যায়। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা এতে উদ্বিগ্ন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের যে ধারা চালু হয়েছিল এর ফলে মুসলমানরা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ক্ষুব্ধ হয়। নবাব ভিকার-উল-মূলক তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ সরকারের কথা ও কাজের উপর আস্থা রাখতে পারবে না।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব গ্রহণ: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর নেতৃত্ব ঢাকার নবাব পরিবার, ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, চট্টগ্রামের সৈয়দ শামসুল হুদা, টাঙ্গাইলের স্যার এ. কে. গজনবীসহ নেতৃত্ব অভিজাত ও জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অন্ধ অনুগত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও যুব সম্প্রদায় এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ আনুগত্যের বদলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া: মুসলমানদের অসন্তোষ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ রদের পরের মাসেই (১৯১১ সালের জানুয়ারি) বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। ড. রাসবিহারী ঘোষসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। এর সফল পরিণতিতে **১৯২১** সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গরদের ফলে বহু চেষ্টা করেও তাই **১৯৪৭** সালে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সফল হয়নি।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২)

প্রথম মহাযুদ্ধে 'অটোম্যান-জার্মান অক্ষ শক্তি' গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ শেষে গ্রেট ব্রিটেন ও মিত্রশক্তি অটোম্যান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে এর শক্তিকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই লক্ষ্যে অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ অংশ তুর্কিয়েকে ১৯২০ সালে অপমানজনক 'স্যাভার্স চুক্তি' স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯২০ সালে ভারতীয় মুসলমান জনগণ আন্দোলন শুরু করেন। কেননা ভারতীয় মুসলমান জনগণ অটোম্যান সুলতানকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা ও ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করতো। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। এ আন্দোলন 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত।

খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের প্রতিও তার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতায় পরিণত হন। ১৯২১ সালের ৫ নভেম্বর কংগ্রেস 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করলে অহিংস আন্দোলন দ্রুত সহিংস রূপ ধারণ করতে থাকে। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের নিকটবর্তী চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষিপ্ত জনতা ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ৫ ফেব্রুয়ারি একজন দারোগাসহ ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। গান্ধীজী আন্দোলনের এ সহিংসরূপ দেখে মর্মাহত হন এবং আকস্মিকভাবে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সভায় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ সময় তুরস্কের (বর্তমান তুর্কিয়ে) বিপ্লবী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি তুরস্ককে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা এবং 'খিলাফত' তথা তুরস্ক 'সালতানাত' কে বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে ১৯২৪ সালে ভারতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

অসহযোগ আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পেঁছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার 'রাওলাট আইন' পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। সরকারের দমননীতির পাশাপাশি চলে সংবাদপত্রে হস্তক্ষেপ। তাছাড়া মহাযুদ্ধে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ সালে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হয়েছিল। তবে এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে। প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা এবং ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি। এছাড়া মানিকতলা বোমা হামলাসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ সময় ফাঁসি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে কারাবন্দী ও দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এই সমস্ত চরম দমননীতির কারণে প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। এই আন্দোলন কলকাতাকেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সময় বিপ্লবীরা আবার হত্যা, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় গোপনে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কলকাতা ও পূর্ব বাংলার যশোর, খুলনায় অনেক সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়। হার্ডিঞ্জ বেঁচে যান। কিন্তু, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

১৯১৬ সালের ৩০শে জানুয়ারি ভবানীপুরে হত্যা করা হয় পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। এভাবে হত্যা, খণ্ডযুদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেলে সরকার প্রতিরক্ষা আইনে বহু লোককে গ্রেফতার করে। ১৯২২ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড। বিপ্লবীরা অত্যাচারী পুলিশ সদস্যদের হত্যার আহ্বান জানিয়ে লালবাংলা শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে অনেক বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলে বিপ্লবী কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯৩০ সালে মাস্টার দা সূর্যসেন গনেষ ঘোষ, লোকনাথ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, সুহৃদ রয় প্রমুখ বিপ্লবীদের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা অস্ত্র লুটে অক্ষম হলেও অস্ত্রাগারের টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন করেন। সংঘাতে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনীর বেশ কিছু পুলিশ হতাহত হয়। ঘটনার ফলস্বরূপ সূর্যসেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেক নির্যাতনের পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

দ্বিজাতি তত্ত্ব

১৯৪০ সালের মুসলিম লীগ সম্মেলন উপমহাদেশের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ২২ মার্চ, সম্মেলনের সভাপতির বক্তব্যে পাকিস্তান জাতির পিতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তার বিতর্কিত “দ্বিজাতি তত্ত্ব” উপস্থাপন করেন। এর পরদিনই শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর বিখ্যাত “লাহোর প্রস্তাব” উত্থাপন করেন। এই দুটি ভাবনা ও ডকুমেন্টের ওপর ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছে।

পাকিস্তান: ধারণা ও বিভ্রান্তি

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহ্‌র সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক “লাহোর প্রস্তাব” বা “পাকিস্তান প্রস্তাব” নামে অভিহিত। লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

- ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।
- এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর—পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো’ (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।
- ভারতের ও নবগঠিত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।
- দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

[উৎসঃ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন]

দ্বিজাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব উভয়েই একাধিক মুসলিম সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছিল। যে বিষয়টি পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে একটি পাকিস্তানে পরিণত হয়েছিল। এই সংশোধনটিই উপমহাদেশজুড়ে অজস্র রক্তপাতের নেপথ্যে।

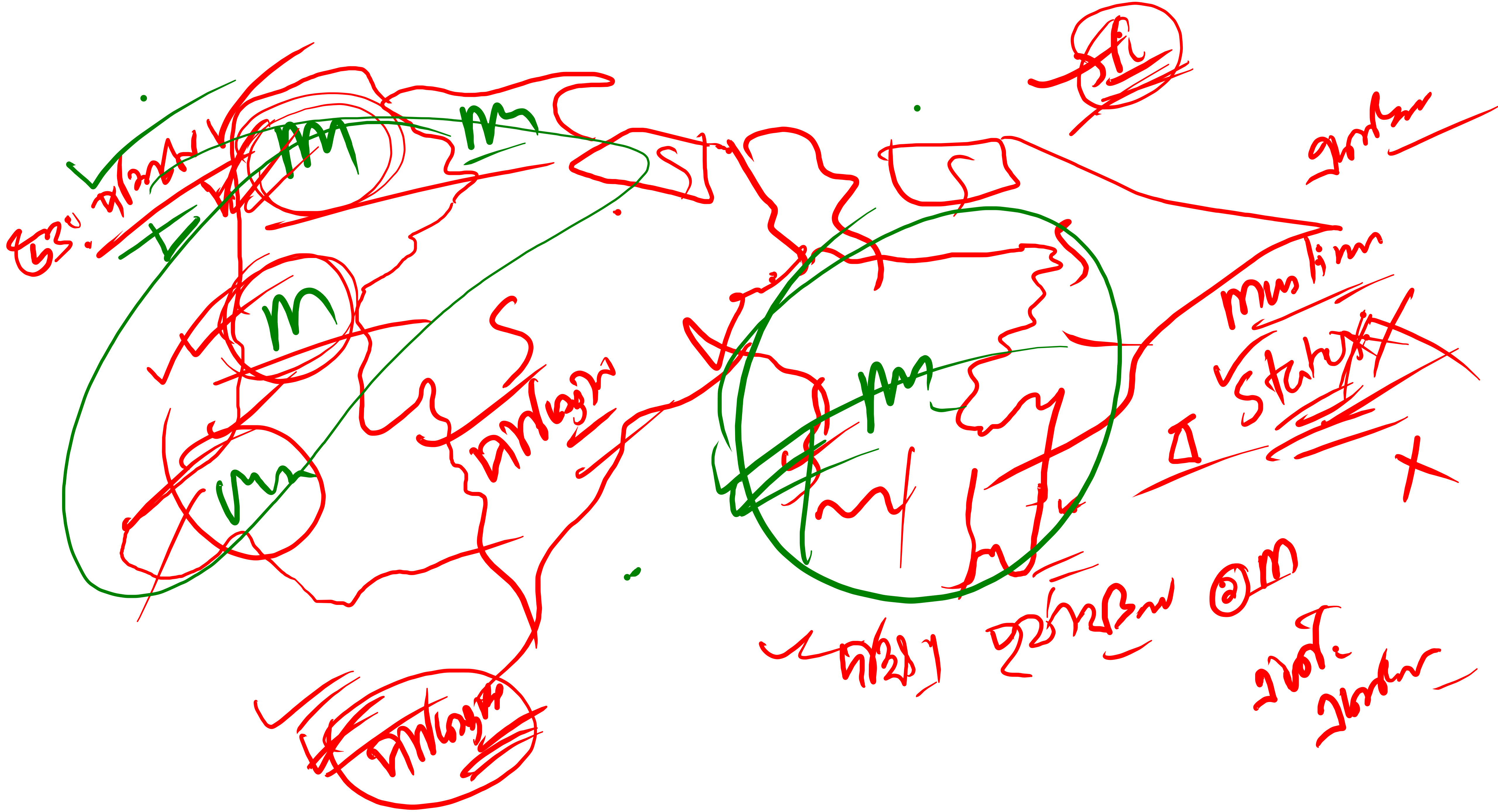

Muslim
Status

পাকিস্তান: ধারণা ও বিভ্রান্তি

ভারত স্বাধীনতা আইন

ভারত বিভাগ সংক্রান্ত ১৯৪৭ সালের লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই এই আইন কমন্স সভায় এবং ১৫ জুলাই লর্ডস সভায় পাস হয়। ১৮ জুলাই রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা বিলটি আইনে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই আইন ছিল সর্বশেষ পদক্ষেপ। ভারত স্বাধীনতা আইনের বাস্তবায়নে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও তার পর দিন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত এর জন্ম হয়।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝায়? [৪৪তম বিসিএস]
- উয়ারী-বটেশ্বর-এর পরিচয় দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- 'প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পর্যটক আকর্ষণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান'- ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় উপস্থাপন করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- সাঁওতাল অথবা গারো জাতিসত্তার জীবনাচরণ বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলতে কী বোঝায়? [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-কে কাজে লাগাতে হলে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- জনশুমারি কী? [৪৩তম বিসিএস]
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? [৪৩তম বিসিএস]
- (গ) বাংলাদেশের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘পরিবার পরিকল্পনা’ বলতে কী বোঝেন? [৪০তম বিসিএস]
- জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং তার সফলতা বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন। [৪০তম, ২২তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান মূল্যায়ন করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কোনো ভূমিকা আছে কি? [৩৮তম বিসিএস]
- বাঙ্গালি একটি শংকর জাতি- ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বর্ণনা দিন। [৩৭তম বিসিএস]
- ১৮৭১ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি এবং কী কী? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৩তম, ৩২তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি সংস্কৃতি কীভাবে প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে? বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
- ১৯৪৭ উত্তর সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে এর বর্ণনা দিন। [৩৪তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

টীকাসমূহ:

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে কাদের বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস]
- নরগোষ্ঠী (Race) ও জাতি (Nation) এর মধ্যে পার্থক্য সমূহ লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]
- স্বাস্থ্যনীতি। [৩০তম বিসিএস]
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। [২৯তম বিসিএস]
- জুমচাষ পদ্ধতি কি? [২৮তম, ১৭তম, ১০তম বিসিএস]
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী? [৩৫তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ললিতকলা। [৩৪তম বিসিএস]
- নগর সভ্যতা। [৩৪তম বিসিএস]
- রাম সাগর। [৩৩তম বিসিএস]
- ঢাকাই মসলিন। [৩৩তম বিসিএস]
- জাতীয় সংস্কৃতি [৩১তম বিসিএস]
- তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। [৩১তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ:

- ➲ পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়? [৩৩তম বিসিএস]
- ➲ বঙ্গদেশে কবে আর্যদের আবির্ভাব ঘটে? [৩৩তম বিসিএস]
- ➲ কোন মুসলিম সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হন? [৩৩তম বিসিএস]
- ➲ মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? [৩৩তম বিসিএস]
- ➲ বঙ্গভঙ্গ কী? [৩৩তম বিসিএস]
- ➲ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বাংলাদেশের কোন অংশ? [৩৩তম বিসিএস]
- ➲ বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরের কী নাম এবং বর্তমানে তা কোথায়? [৩৩তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

৩৬ তম বিসিএস:

(ক) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে প্রবাল দ্বীপ এর গুরুত্ব কি?

(খ) বাংলাদেশের নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ সমূহ বলতে কি বুঝেন?

(গ) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বরেন্দ্র যাদুঘর এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩৫ তম বিসিএস:

(ক) দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী?

(গ) বাংলাদেশের বনজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(ঘ) তিস্তার পানি সংকটের পরিবেশগত প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy